Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ জানুয়ারি, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৮ জানুয়ারি, ২০২১, সোমবার, ৪ মাঘ, ১৪২৭

## ভোলানাথ ঘোষকে স্মরণ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জানুয়ারি, বর্ধমান :** সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি প্রবীণ কমিউনিস্ট ও জেলার হিসাবরক্ষক ভোলানাথ ঘোষকে স্মরণ করলো। এদিন জেলা দপ্তরে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রয়াত ভোলানাথ ঘোষ স্মৃতিচারণ করেন প্রাক্তন জেলা সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার। সভায় শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন সভার সভাপতি জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। সভার শুরুতে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। প্রয়াত ভোলানাথ ঘোষের পরিবারের পক্ষে তাঁর পুত্র অমিয় ঘোষ জেলা তহবিলে ২০ হাজার টাকা দেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অঞ্জু কর, আভাস রায়চৌধুরী, সৈয়দ হোসেনসহ জেলা নেতবৃন্দ ও তাঁর গুণমুগ্ধরা।

## গ্রামে গ্রামে চলছে কৃষক জাঠা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি :** কৃষকমারা ৩টি কৃষি নীতির বিরুদ্ধে এবং দিল্লীতে হাড়হিম ঠাণ্ডার মধ্যে লাখো লাখো কৃষকের আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে, চাষির খামার থেকেই সরকারকে নির্ধারিত দামে ধান কিনতে হবে, জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে, দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে এক প্রচার জাঠা শহরের চারটি ওয়ার্ড পরিক্রমা করে। আদিবাসী মহিলাদের নৃত্যের তালে তালে গুসকরার শান্তিপুরের কাটিং পাড়া থেকে শুরু করে শান্তিপুরের ২ টি ওয়ার্ড ঘুরে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত ইটাচাঁদা-র বিভিন্ন পাড়া, তুরি পাড়া পরিক্রমা শেষে নতুন থানা হয়ে স্কুল মোড় এসে পদযাত্রা-র সমাপ্তি ঘোষণা হয়। মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কৃষক সভার পক্ষ থেকে কৃষি বিল পোড়ানো হলো। মেমারি জিটিরোড চৌমাথার মোড়ে। কৃষকদের দাবি না মেনে কর্পোরেট দের স্বার্থ দেখতে ব্যস্ত। সরকার নয়া কৃষি আইন করে কৃষকদের কর্পোরেটদের দাস তৈরি করছে। এদিন দিল্লির কৃষক আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মেমারি জিটি রোড চৌমাথার মোড়ে প্রশান্ত কুমার। বিক্ষোভ সভায় ছিলেন অশোক যশ, অনিল মুখার্জী, ফারাদ আলি মণ্ডল প্রমুখ। গলসী অঞ্চল কৃষকসভার উদ্যোগে গলসী বাজারে এক পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সাইফুল হক ও অমিতাভ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন আব্দুল হালিম মল্লিক। সভার শেষে নয়া কৃষি আইন ও মোদীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

## ২ ফেব্রুয়ারি সিপিআই(এম)-এর সমাবেশে আসছেন মানিক সরকার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ জানুয়ারি, বর্ধমান :** কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহের প্রতিবাদে রাজ্যে হাল ফেরাতে ২ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান টাউন হলে ময়দানে জনসভার আহ্বান করেছে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি। এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এই সমাবেশ ঘিরে জনসংযোগ ও নিবিড় প্রচার চলছে সমগ্র পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে। গ্রাম থেকে শহরে প্রতিদিন চলছে মিটিং, মিছিল, পথসভা ও দেওয়াল লিখন। সিপিআই(এম) কী সমর্থকরা পাড়ায়-পাড়ায় সারছেন পাড়া বৈঠক। ২ ফেব্রুয়ারি শহরকে লাল পতাকায় লালে-লাল করতে চান। বৃহত্তর সমাবেশে পরিণত করা চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তাঁরা। তার প্রস্তুতি চলছে গ্রাম-শহরে।

## দেবীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা ডেপুটেশন সিপিআই(এম)-এর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১২ জানুয়ারি :** ফের প্রশ্নের মুখে চিকিৎসা পরিকাঠামো। পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার অন্তর্গত, দেবীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসকের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসার পরিষেবা। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকলেও ডাক্তার ও নার্স না থাকার জন্য সঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একজন মাত্র ডাক্তার তিনি মাত্র ৩ দিন সপ্তাহে আসেন। এবং তিন ঘন্টা করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে মেমারি হাসপাতালে তিনি ডিউটি করেন। একসঙ্গে দুদিকে সামলানো কার্যত প্রায় অসম্ভব।

সিপিআই(এম) মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দেবীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে বামকর্মী ও গ্রামবাসীরা অবস্থান-বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভা চলাকালীন ৫ জন প্রতিনিধি ৬ দফার দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি তুলে দেন দেবীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট সুদিন ভট্টাচার্যের হাতে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন হীরুলাল সরেন, উদয় ঘোষ, অসিত রায়, ষষ্ঠীচরণ পাল, শঙ্কর কর্মকার।

অভিযোগ করেন, হাসপাতালে নির্দিষ্টভাবে রোগী ভর্তি রাখার কোন পরিকাঠামো নেই। রাতের অন্ধকারে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ চলতে থাকে।

ডেপুটেশনে দাবিগুলো হলো, সপ্তাহে ৬ দিন আউটডোরে ডাক্তারবাবুকে উপস্থিত থাকতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবিলম্বে রোগী ভর্তির পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে, স্টাফ নিয়োগ করতে হবে, স্টাফদের বসবাসের জন্য ও ইন্ডোর, জরুরি পরিষেবার জন্য গৃহ নির্মাণ করতে হবে, প্রয়োজনীয় ওষুধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সরবরাহ করতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। দেবীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট সুদিন ভট্টাচার্য কার্যত সব অভিযোগ স্বীকার করে নেন।

পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫ থেকে ১৭ টি গ্রামের বাসিন্দারা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এই এলাকা থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গ্রামীণ হাসপাতাল। কিন্তু দেবীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায়। পার্শ্ববর্তী হুগলি জেলার বেশ কিছু মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা নেওয়ার জন্য আসেন।

## বিবেকানন্দের জন্মদিনে রক্তদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জানুয়ারি, গলসী :** জাতীয় যুব দিবস ও বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গলসী এডিবি শাখায়। ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও গ্রাহকরা রক্তদান করেন। ২২ জন মহিলা সহ ৬০ জনের রক্ত সংগ্রাহ করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাডব্যাঙ্ক।

## মেমারির বুকে হিমাচল, শুরু আপেল চাষ চাষিদের বিপুল সম্ভাবনা

**নূর আহমেদ :** পথপ্রদর্শক হিসেবে আবারো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের নাম। গত ১৩ জানুয়ারি বিদ্যালয় আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে করোনা বিধি মেনে এলাকার তথা বাংলার কৃষকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুলের মাটিতে বাণিজ্যিকভাবে আপেল চাষের সূচনা করলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অরুণকান্তি নন্দী।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বশাসিত সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেশন ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় ভারতের মধ্যে প্রথম স্কুল, যারা এলাকার চাষিদের আপেল চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিলেন। জানা গিয়েছে, এর আগে গুজরাট, কিংবা উত্তরপ্রদেশের পরিবেশে যে পদ্ধতিতে ন্যাশনাল ইনভেশন ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া আপেল চাষের উদ্যোগ নিয়েছে ঠিক সেই পদ্ধতিতেই অর্থাৎ 'এইচ আর এম এন ৯৯' প্রজাতির আপেল চারা ও বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁদেরই সহযোগিতায় পশ্চিম বাংলায় মেমারির এই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের তত্ত্বাবধানে সূচনা হলো আপেল চাষের। স্কুলের মাটিতেই হবে এই চাষ। এর আগে আয়ুর্বেদিক জীবাণুনাশক টানেল বানিয়ে নজর কেড়েছে এই স্কুল। জানা গিয়েছে, হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর থেকে বিশেষ প্রজাতির আপেল গাছের

উদ্ভাবক হরিমান শর্মার কাছ থেকে আপেল চারা নিয়ে আসা হয়েছে। দ্রুত রোপণের কাজ সেরে ফেলতে চাইছে স্কুল প্রশাসন। ২০টি আপেল চারা রোপণের জন্য জমি প্রস্তুতের কাজ চলছে জোরকদমে। ভারত সরকারের উক্ত সংস্থা ও স্কুলের আশা, গাছ লাগানোর দু'বছরের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে উৎপাদন। আর সেটা হলে আপেল চাষে রাজ্যকে পথ দেখাবে এই স্কুল। বাণিজ্যিকভাবে এই আপেল চাষ যে সফল হবে কিংবা স্বাদে, আকৃতি বর্ণে কতটা হিমাচল সমমানের হবে সেই নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী কৃষি বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীগণ। স্কুলের অধ্যক্ষ বলেন, স্কুলে আপেল চাষের বিশেষজ্ঞ তৈরির

*—এরপর ছয়ের পাতায়*

# নতুন চিঠি

১৮ জানুয়ারি, ২০২১


## শুরু হয়ে যাক লড়াই!

লড়াইটা এবার শুরু করা যাক! বাম কংগ্রেস আলোচনা শুরু, এমাসেই চূড়ান্ত হবে বিধানসভার আসন বন্টনের কাজ। দিল্লিতেও মাসাধিককাল অবস্থানরত কৃষকরা প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে প্যারেড করবেন স্থির করেছেন। নেতৃত্ব দেবেন মহিলারা—হোক সমাবেশ!

কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত বেহায়াপনার নিদর্শন দেখছে সারা দেশের মানুষ। রামমন্দির তৈরির টাকা তুলতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক-কে। শুধু আত্মসাতের রাজনীতি! অতিমারীর রাজনীতিতে মহামারির রাজনীতি আর কাকে বলা যায়!

তাই মুখোশের আড়ালে নয়, লড়াই এবার হবে মুখোমুখি।

রাজ্যের জনসংখ্যার তুলনায় কোভিড মহামারীর টিকা অপ্রতুল। টিকা নিয়ে চলছে কাড়াকাড়ি রাজনীতি। ক্ষমতার দম্ভে কেন্দ্র এবং রাজ্য শাসকদলের নেতারা এতটাই অন্ধ যে, বুঝতে পারছে না টিকা না পাওয়া জনগণের অংশ কোভিড মহামারি বা অতিমারিকেই শক্তিশালী করতে পারে।

টিকার দুর্নীতির বিশৃঙ্খলা অতিমাত্রায় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে আগামী দিনে। এই সামান্য কথা বোঝার অতিসাধারণ জ্ঞানটুকুও তাদের নেই। সার্বজনীন টিকাকরণের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব হেলাফেলা করে বিজেপি-তৃণমূলের নেতকর্মীরা কদর্য ঝগড়ার যে পরিবেশ তৈরি করেছে, তা ওই দুই শাসকদলের পুরনো কৌশল—এসব বুঝতে সাধারণ মানুষকে আর বুদ্ধি খরচ করতে হয় না।

বিজেপি এবং তৃণমূল উভয়ের বিরুদ্ধেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্যের ভিত্তিতে বাম কংগ্রেসের বিকল্প শক্তিকে জয়ী করার ডাক উঠেছে। বিজেপি-তৃণমূল, দুই জনবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র এই শক্তি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিল্প, কৃষি, গণবন্টন ব্যবস্থা, মানুষের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের স্বার্থে কাজ করতে পারে। বাম-কংগ্রেস জোট বিকল্প দিশা দেখাতে পারে। সেজন্য ধর্ম নয়, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে আসুন! শুরু হয়ে যাক লড়াই!

## দুর্ঘটনায় আহত ছোটপর্দার আদ্রিজা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জানুয়ারি :** কলকাতা থেকে কালনায় নিকট আত্মীয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে আজ সড়ক দুর্ঘটনা মধ্যে সপরিবারে পড়ে ছোটপর্দার আদ্রিজা মুখার্জি। ফিরকি, বালিকা বধূ সহ বিভিন্ন সিরিয়ালে অভিনয় করা আদ্রিজা মুখার্জি সহ পরিবারের ৬ জন কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কালনা থানার কেশবপুরের জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বসু হলেন তাদের নিকট আত্মীয়। সেই বিদেশ বসুর গ্রামের বাড়িতে ছিল পারিবারিক অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আদ্রিজা মুখার্জি সপরিবারে একটি গাড়িতে করে সাড়ে বারোটা নাগাদ এসটিকেকে সড়ক ধরে আসার পথে কালনা ঢোকার মুখে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে। দুরন্ত গতিতে চলায় পথে তাদের গাড়ির একটি চাকা খুলে যায়। গাড়িটি ভারসাম্য হারিয়ে কয়েকটি পাল্টি খেয়ে পাশের আলুর জমিতে গিয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের জানালা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে উদ্ধার করে কালনা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতলে নিয়ে যায়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। আদ্রিজা সহ আহতরা হলেন—তার মা-বাবা ইঙ্গিত মুখার্জি ও মৌমিতা মুখার্জি, গৌরাঙ্গ দে, রিতা দে এবং প্রসুন দে। খবর পেয়ে কালনা হাসপাতালে ছুটে চলে আসেন জাতীয় ফুটবলার বিদেশ বসু। তিনি বলেন গাড়িটি অদ্রিজার মা মৌমিতা চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ চলন্ত অবস্থায় গাড়িটির চাকা খুলে গিয়ে এই বিপত্তি।

## এক ডজন প্রশ্ন

১. ২০২১ সালকে কোন আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে? কোন দেশ বিষয়টি পেশ করে?
২. প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গজয়ী স্যার এডমন্ড হিলারী কবে প্রয়াত হন? তাঁর বাড়ি কোথায় ছিল? তাঁর জন্ম কবে? কবে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন?
৩. ছোট গল্পের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম জ্যাক লন্ডন কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
৪. কোন সালে কোন দিন জাতীয় যুব দিবস ঘোষণা করা হয়?
৫. আন্তর্জাতিক যুব দিবস কবে পালন করা হয়?
৬. ভারতের প্রথম মহাকাশচারী কে ছিলেন? তাঁর কবে কোথায় জন্ম হয়? তিনি কবে মহাকাশে যান?
৭. বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি কে? তিনি কত সালে জন্মান? তাঁর নিজের পুত্র সন্তানের কবে জন্ম হয়?
৮. কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মান? এই দিন আর এক কমিউনিস্ট নেতার জন্ম হয় তাঁর নাম কি?
৯. ভারতে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া কবে গঠিত হয়?
১০. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ কবে প্রয়াত হন? কবে তিনি জন্মান?
১১. আধুনিক ছোটগল্পের জনক আন্তন চেকভ কবে কোথায় জন্মান?
১২. কবি নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে শোনান?

**(উত্তর শেষের পাতায়)**

# বিবেকানন্দের ধর্মভাবনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

**জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য**

একজন ধর্মীয় মহাপুরুষ হিসাবেই বিবেকানন্দের প্রাথমিক প্রসিদ্ধি। কিন্তু তাঁর অনন্যতা এইখানে যে বস্তুসত্যের ও সমাজসত্যের কঠিন মাটির উপরে দাঁড়িয়েই তিনি ধর্মীয় ভাবসত্য সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকে তুলে ধরেছেন। এবং তারই আলোকে ধর্মের নামে নানা বিকারের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

**ধর্মের তিনটি স্তর**

ধর্মের তিনটি স্তরের কথা বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন—সর্বোচ্চ দার্শনিক স্তর, স্থূল পৌরাণিক স্তর ও স্থূলতর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্তর। ৩/২৭৪-৭৫) দার্শনিক স্তরে 'সব ধর্মই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—একটি অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব'। (৩/১২) পুরাণ বলতে বিবেকানন্দ বুঝিয়েছেন মহাপুরুষ বা বীরগণের জীবন, দেবতা উপদেবতা বা দেবমানবের নানা উপাখ্যান। এর মধ্যেই যারা ইতিহাস খুঁজতে যায়, তাদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য, তারা ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা-ই উপলব্ধি করতে পারে না। অতীতের ধর্মীয় নির্মাণ কখনও প্রকৃত ইতিহাস হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। (৩/১৫২-৫৩) আর ধর্মের স্থূলতর স্তরটি হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্তর। বিবেকানন্দের মতে, এগুলি কুসংস্কার, যা ধর্মকে অধঃপাতিত করে। অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান বলবৎ করে হিন্দু ধর্মগুরুরা ধর্মকে কোথায় টেনে নামিয়েছে তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেবে, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে?" (৬/৪১১) পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কে তাই তাঁর ক্রুদ্ধ ও শ্লোষাত্মক উক্তি—''দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যতসব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে আমাদের শেখায় (কিন্তু মনে রাখবেন যে, এইসব দুষ্ট পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃপিতামহগণ গত চারশ-পুরুষে ধরে এক খণ্ড বেদও দেখেননি); সাধারণ লোকে সেগুলি মেনে চলে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। তাই তাঁর দ্বিধাহীন ঘোষণা, ''প্রথমে দুষ্টু পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনো প্রসার হবে না।" (৬/৩৫৯)

ধর্মের অবিভাজ্য অঙ্গ পাপ-পুণ্যের ধারণা সম্পর্কেও তাঁর দ্বিধাহীন উক্তি—''ভগবান একজন রাজা নন, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন এক কোণে বসিয়া মর্ত্যবাসী মানুষের কর্ম অনুযায়ী দণ্ড বা পুরস্কার বিধান করিতেছেন।... এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ সত্যের উপলব্ধি করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবে এবং বলিবে—আমি ঈশ্বর।" (১০/৫৮)

**ধর্ম ও বিজ্ঞান**

একটি অনন্ত সত্তা তথা ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রত্যেক ধর্মের সাধারণ দার্শনিক ভিত্তি হলেও সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ-কথা বিবেকানন্দ মানেন না, কেননা তা হলে 'সকল বিজ্ঞানের অবসান' ঘটবে। (১০/৩৬) তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ''প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ থাকে। ...অবিদ্যমান কারণ হইতে কোন কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি যদি আগুনে আঙুল দিই, সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল ফলিবে—আঙুল পুড়িয়া যাইবে। আমি জানি আগুনের সহিত আঙুলের সংস্পর্শ-ক্রিয়াই হইল দাহের কারণ।" (১০/৬৩) তাই অলৌকিক ঘটনা বলেও কিছু তিনি মানেননি। তাঁর কথায়, ''আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এলাকার বাইরে আশ্চর্য অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ঐগুলি কোন না কোন নিয়মের অধীন। আমাদের ধর্মের সহিত ঐগুলির কোনও সম্পর্ক নাই।" (১০/৩৮)

**ধর্ম ও সমাজ**

ধর্মের সামাজিক ভূমিকার বিষয়টি বিবেকানন্দের ধর্মদর্শনের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। যা সর্বমানবের কল্যাণ করে না, তাকে তিনি প্রকৃত ধর্ম বলেই মানতে চাননি। বহুরূপে সম্মুখে যে মানুষ তাকে ছেড়ে ঈশ্বর-সন্ধান বৃথা। 'জীবে সেবা করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—বিবেকানন্দের এই বিখ্যাত বাণী কে না জানে! 'সমাজ থেকে ধর্মকে দূরে থাকবার নির্দেশ প্রচার' করার আহ্বান জানিয়ে বিবেকানন্দ দৃঢ় ভাষায় বলেন, ''সামাজিক বিধিনিয়ম প্রণয়নের কোন অধিকার ধর্মের নেই। ...পুরোহিতের কী অধিকার আছে প্রত্যেকটি সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবার।" (৪/৩০২-০৬) তাঁর প্রশ্ন, ''... পুরোহিতের কী অধিকার আছে প্রত্যেকটি সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবার।" (৪/৩০২-০৬) তাঁর প্রশ্ন, ''যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম?" (৬/৪১১) ''একজন বুভুক্ষু লোককে ধর্ম শেখানোর অর্থ তাকে কেবল পরিহাস করামাত্র।" (৪/১৭৭) শুধু ধর্মের পরিচয়ে পেট ভরে না। তার জন্য অন্য ব্যবস্থা চাই। শুধুমাত্র ধর্ম খাইয়ে ''পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ।" (৬/৪১) তাই তিনি নিরাবরণ স্পষ্টতায় বলেন, ''যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা হয় না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!" (৬/৪১২)

হিন্দুসমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য যে জাতিভেদ প্রথা, তা যে আদৌ কোনো ধর্মীয় বিধান নয়, পচে যাওয়া একটি সামাজিক কর্মভেদের রূপ ও তার বিধান মাত্র, সে বিষয়টিও পরিষ্কার করে দিয়ে বিবেকানন্দ বলেন, ''এবিষয়ে পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে।" (৬/৩৮৪) জাতিকাঠামোর নিম্নতর স্তর হিসাবে শূদ্ররা কী ভয়ানক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''কেবল যাদের শারীরিক পরিশ্রমের উপর ব্রাহ্মণের প্রভাব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা এবং বৈশ্যের অর্থ অধিগত করা সম্ভব হয়েছে, তাদেরই জন্য দয়ালু ভারত এই কোমল ব্যবস্থা করল : তার জিব কেটে দাও, তার মাংস ছিন্ন কর এবং এইরকম আর অনেক প্রকার শাস্তি বিধান।" (৪/৩৯৯) এইভাবেই জাতিভেদ পরিণত হয়েছে এক নির্মমতম শোষণব্যবস্থায়।

জাতিভেদ ব্যবস্থার মতোই সমাজের অর্ধাংশ যে নারী তার অধিকার হরণকারী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বিবেকানন্দ যথেষ্ট সরব। বেদান্তশাস্ত্রে একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজমান বলা সত্ত্বেও, তাঁর ভাষায়, ''স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিকে বদ্ধ ক'রে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) ক'রে তুলেছে।" (৯/২০০) চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালেই নারীদের এক বিশেষ সভায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তার মনোভাব।... পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই পূর্ণ নারীত্ব।" (১/৩৬) আলমোড়া থেকে মিস নোবেল (নিবেদিতা)-কে ভারতে আহ্বান জানিয়ে এক চিঠিতে (২৯ জুলাই, ১৮৯৭) তিনি লিখেছিলেন, ''ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন।" (৭/৩৮২)

**ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকা**

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে, শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর বিশ্ববন্দিত ঐতিহাসিক ভাষণে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।" (১/১০)

'ধর্ম' ও 'সম্প্রদায়' এই দুটি শব্দের অর্থগত পার্থক্য নির্ণয় করে বিবেকানন্দ বলেন, ''আমাদের মতে ধর্মগুলি ধর্মমতের মধ্যেই অনুস্যূত। আমরা পরমত-অসহিষ্ণুতা ছাড়া সবকিছুই সহ্য করি। অপর শব্দটি 'সম্প্রদায়', তাহার অর্থ একটি সমমত-সমর্থক সখ্যবদ্ধ ব্যক্তির দল, যাঁহারা নিজদিগকে ধার্মিকতার আচরণে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া বলিতে থাকেন, আমাদের মতই ঠিক, তোমরা ভুলপথে চলিতেছ।" ধর্মীয় মৌলবাদ তথা ধর্মান্ধতাই যে সাম্প্রদায়িকতার জনক তা নির্দেশ করে বিবেকানন্দ বলেন, ''ধর্মের

*—এরপর পাঁচের পাতায়*

# দেশ ও সমাজ

## সুভাষচন্দ্র বসু : সমাজতন্ত্র-বামপন্থা-কমিউনিজম

**শশধর মিস্ত্রি**

'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জায়গায় লিখেছেন—''গাছের ভাঙা ডাল আর শুকনো পাতা গাছের চরম প্রকৃতি নহে, বনস্পতিকে সমগ্র করে দেখতে হয়।'' সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বাঙালি সমাজের আবেগ অবশ্যই সম্মানের। যদিও উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বোসবাবুকে (সুভাষচন্দ্র বসু) দেবজ্ঞানে ভক্তি করেন এবং নিজ নিজ সন্তানকে অনেকেই বোসবাবুর মতো সৈনিক হতে আকাঙ্ক্ষা করেন। বিদেশেও ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের, সত্যজিৎ রায়ের, বিবেকানন্দের এবং সুভাষের দেশ বলে ভারত থেকে যাওয়া অতিথির সামনে অঘ্রাণের পাকা ধানের শীষের মতো মাথা নত করতে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক একটা প্রশ্ন বুদ্ধিজীবী মহলে খুবই ভেসে বেড়াত—তা হলো নেলসন ম্যাণ্ডেলা কি কমিউনিস্ট ছিলেন? এই প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট উত্তর ম্যাণ্ডেলা দেননি। কিন্তু ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ স্টিফান এলিস তাঁর গবেষণায় প্রকাশ করেছেন ম্যাণ্ডেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে থাকলেও কংগ্রেসের একটি অংশ, বিশেষ করে শীর্ষ নেতৃত্ব, তাঁকে মেনে নিতে পারেননি এটা সকলেরই জানা। কিন্তু এর পাশাপাশি আজও কিছু মানুষের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এক আইনজ্ঞ পিতার সন্তান নরেন্দ্রনাথ যখন ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তিনি আত্মোদ্ধার বা স্বর্গরথে চড়ে নিজেকে পরমাত্মায় মিলন ঘটাতে সন্ন্যাসী হননি। তিনি মনপ্রাণ নিযুক্ত করেছিলেন মানুষের দুঃখ বেদনা দূর করার সাধনায়। কেবল ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র পাশ্চাত্য ভূমিতে তাঁর বিজয়রথ ধাবিত হয়েছিল। তিনিই সম্ভবত ভারতের প্রথম ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন 'আমি সমাজতন্ত্রী'। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—

''বীর সন্ন্যাসীর বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়—
বাঙালির ছেলে ব্যায়ে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।''

আর এক প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞের পুত্র সুভাষচন্দ্র বসু। তিনিও মানুষের বেদনায় সাড়া দিয়ে সাংসারিক জীবনকে এড়িয়ে বিশেষ পথে হাঁটতে চাইলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন না। কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর গৈরিক বর্ণে মনকে রাঙিয়ে নিয়ে পা বাড়ালেন মানুষের কল্যাণ কাজে। এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করা। সুভাষচন্দ্রের কাজকর্মও কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি এবং বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জুড়েই তাঁর পদচারণায় মুক্তি সংগ্রাম প্রেরণালাভ করেছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেতাজি হঠাৎ উল্কাপিণ্ডের মতো হাজির হননি। বাংলার মাটিতে শ্রীচৈতন্যের আমল থেকে যে রেনেসাঁসের সূচনা; রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দেশবন্ধু, সূর্য সেন, রাসবিহারী প্রমুখরা পরবর্তীকালে যে ঢেউ তুলেছিলেন, তারই মহত্তর রূপ সুভাষচন্দ্র বসু।

তিনি তাই সমুচ্চ পদের দুর্জয় বাসনা বর্জন করে দেশ সেবার কাঁটা বিছানো পথে হাঁটতে লাগলেন। রাজনীতিতে পা ফেলেই তিনি চলে গেলেন সবরমতী আশ্রমে, সেখানে দীক্ষা গ্রহণ করতে চাইলেন ভারতমাতার মুক্তিকামী অন্যতম কাণ্ডারী গান্ধীজির কাছে। বোধহয় প্রথম দিনেই উভয়ে উভয়কেই চিনতে পেরেছিলেন। তাই গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন দেশসেবার ঋত্বিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে। সরোজিনী নাইডুর ভাষায় এই 'Flaming sword'-কে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় বুঝেই গান্ধীজি সুভাষকে কাছে টানেননি। কর্মবীর দেশবন্ধুর সান্নিধ্যেই সুভাষের সাধনা শুরু হলো। কিন্তু অল্প দিনেই ছন্দপতন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু (১৯২৫), তাঁর পাশে দাঁড়ালেন বাংলার দামাল সন্তান বিপ্লবীরা। উল্কার গতিতে প্রকাশ হতে থাকল সুভাষের রাজনৈতিক প্রতিভা।

আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হলেও কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতা অর্জনই তাঁর চিন্তা ও সাধনাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। স্বাধীন ভারতবর্ষের আর্থিক ও সামাজিক রূপ কেমন হবে তার মডেলের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি কৃষি নয়, শিল্প-প্রধান ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন। রাশিয়ার সফল বলশেভিক বিপ্লব তাঁর চিন্তা মননে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র। সাংখ্য দর্শন, শংকর বেদান্ত বা মায়াবাদী দর্শনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও হেগেলীয় দর্শনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, হেগেলের মতে ব্যষ্টি নয়, সমষ্টিবাদ সামাজিক কল্যাণের চাবিকাঠি। রংপুরে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে (৩০ মার্চ, ১৯২৯) সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন—''আমরা এখন আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের তৃতীয় পর্বে উপনীত হয়েছি। প্রথম পর্ব ছিল স্বদেশী যুগ, দ্বিতীয় পর্ব বিপ্লবীদের যুগ, তৃতীয় পর্ব অসহযোগ ও সমাজতন্ত্রের।'' দু-বছর পর করাচিতে এক যুব সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন—''আমি চাই সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ।''

ব্রিটিশ শাসকরা বলশেভিকবাদের সর্বাপেক্ষা প্রবক্তা ও প্রচারক হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুকে চিহ্নিত করেছিলেন। ইংরাজ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টে ও ব্রিটিশ লেখক R. Cupland -এর গ্রন্থে ভারতে লেনিন বা স্ট্যালিনের পথে সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটাতে সক্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশদের এই রিপোর্ট অতিরঞ্জিত হলেও শ্রমিক কৃষকের মুক্তির পথযাত্রী রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বহুবার বহু জায়গায় সাম্যবাদ তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। যদিও সাম্যবাদী আদর্শের শ্রেণি সংগ্রামে তাঁর সবল আস্থা ছিল না কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি বার বার বলতেন, ''এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই যে, সমাজবাদের পথেই ভারত তথা বিশ্বের পরিত্রাণ।'' সমাজবাদের প্রধান প্রেরণা কার্লমার্কসের 'শ্রেণি সংগ্রাম' তত্ত্ব। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের মাটিতে এই সমাজবাদকে ভারতবর্ষের ছাঁচে গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর ভাষায়—''India should produce her own from of socialism as well as her own methods''। যদিও মার্কসবাদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি বললেন—''তবে একথা আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই মার্কস ও লেনিন তাঁদের রচনার মারফত যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করেছেন, তার আমি অনুরাগী।'' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করায় তিনি যে বিবৃতি দেন তার মধ্যে তাঁর বামপন্থার প্রতি আস্থা কতখানি বোঝা যায়—''আমি নিঃসন্দেহে মনে করি যে, আমরা বামপন্থীরা যে উদ্দেশ্যে চলিতেছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত।''

সুভাষ বসুর বামপন্থায় আস্থা কেবল কথার কথা ছিল না। হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনি। তা সত্ত্বেও তারা ওই অধিবেশনে একটি খোলা চিঠি বিতরণ করলেন। যার ভূমিকায়—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমিকের ও জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে যুক্ত মোর্চা গোড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু কমিউনিস্টদের এই আহ্বানকে প্রকাশ্যেই সপ্রশংস অভিনন্দন জানান। পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯) কমিউনিস্টরাই উদ্যোগী হয়ে প্রস্তাব করে সুভাষচন্দ্রকেই কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত করা হোক। সুভাষচন্দ্র বসু কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বামপন্থীদের সম্মিলিত প্রার্থী হিসাবে মনোনীত ও নির্বাচিত হন। এমনকি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত পন্থ প্রস্তাবের সক্রিয় বিরোধিতায় নেমেছিলেন সর্বস্তরের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী সদস্য কর্মীরা। এমনকি কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রকে বিকল্প ওয়ার্কিং কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। এর কয়েকমাস পর যখন ভারতে বাম সংহতি কমিটি গড়ে ওঠে তার সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসু। আর এই কমিটির মেরুদণ্ড ছিলেন কমিউনিস্টরা। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলে কমিউনিস্টরা যৌথ কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও লেনিনের পরামর্শে এম.এন. রায় আন্তর্জাতিকের চতুর্থ মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য পাঁচ ভারতীয়র কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠান।

*—এরপর ছয়ের পাতায়*

## নেতাজী সুভাষ এক জীবন্ত কিংবদন্তী

**মালবিকা রায়**

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, সেই বছরেই ওই সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তিকে যিনি পঁয়তাল্লিশ বছর পরে চ্যালেঞ্জ জানাবেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সেই অসম সাহসী প্রবাদপুরুষ উড়িষ্যার একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে সুভাষচন্দ্রের জন্ম ভারতের জনগণের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন অভিযানের ঠিক মধ্যবর্তী সময়টি চিহ্নিত করেছিল।

সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ বসু ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। সুভাষচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন সেই সময় জানকীনাথ কটকে আইন ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। জানকীনাথ ছিলেন সত্যিকারের পরোপকারী, ধর্মপ্রাণ এবং খাদি, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষক। সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী ছিলেন উত্তর কলকাতার হাটখোলার ঐতিহ্যপূর্ণ দত্ত পরিবারের কন্যা। জানকিনাথ ও প্রভাবতীর আট পুত্র ও ছয় কন্যা, সুভাষচন্দ্র হলেন তাদের মধ্যে নবম। প্রভাবতী ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং বিশেষ বাস্তববোধ ও সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। প্রভাবতী ও জানকীনাথ দুজনেই, তাঁদের দুই সন্তান শরৎ ও সুভাষকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তা ধৈর্য্যের সঙ্গে শান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—''একেবারে কিশোরের যে কথা আমার মনে পড়ে তা হল এই যে নিজেকে নিতান্তই এক তুচ্ছ জীব বলে মনে হত।'' ছোটবেলায় তিনি পিতামাতার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেষভাবে চাইতেন, কিন্তু তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের পরিবারটি ছিল বিরাট এবং তাঁর পিতামাতা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যিনি গোড়ায় নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে করতেন তাঁর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের তাৎপর্যপূর্ণ ধারণাগুলি জানা বেশ আকর্ষণীয় হবে।

পরিবারের অন্যান্যদের মতো সুভাষচন্দ্রকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কটকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইয়োরোপিয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। স্কুলটি ছিল বিলাতি কায়দায় ও ধারায় পরিচালিত। এই ধরনের স্কুলে পড়ায় অতিরিক্ত যা লাভ হয়েছিল তা হল নিয়মানুবর্তিতা, সঠিক আচার-ব্যবহার, কাজে পরিচ্ছন্নতা এবং সময়ানুবর্তিতা। যদিও এই স্কুলে সুভাষ অসুখী ছিলেন না তবু ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে যখন ইয়োরোপিয়ান মিশনারী স্কুল ছাড়ার সময় এল তখন তাঁর কোনো দুঃখ হয়নি। তারপর তিনি যখন র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন, তখন তাঁর সম্পূর্ণ মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন হল। এই স্কুলে যে ভারতীয় পরিবেশ ছিল তাতে তাঁর নিজের সম্বন্ধে ধারণা উচ্চতর হল এবং তিনি নতুন করে আত্মবিশ্বাস পেলেন। র‍্যাভেনস্ কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ওড়িয়া ও বাঙালি দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল এবং তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সুভাষের তরুণ মনে স্থায়ী ছাপ রেখেছিলেন তিনি হলেন র‍্যাভেনস্ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। তিনি তাঁর ছাত্রের বিকাশশীল মনে রুচিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন পনের সেই সময় তিনি তাঁর মানসিক ও আত্মিক জীবনের অন্যতম ঝঞ্ঝাসঙ্কুলকালে প্রবেশ করেন, এবং অন্তরে এক প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব ও কষ্টভোগের সূত্রপাত হয় আর তখনই তাঁর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন। আকস্মিকভাবেই স্বামীজির রচনাবলীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিবেকানন্দ চর্চা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নিজের মুক্তির জন্য কাজ করা এবং মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই হবে জীবনের লক্ষ। ভগিনী নিবেদিতার মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সেবা বলতে নিজের দেশের সেবাও বোঝায়। কারণ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে 'জন্মভূমিই ছিল তাঁর পূজার প্রতিমা।' প্রতিটি ভারতবাসীই তাঁর ভাই এবং লোকশক্তি উত্থানের ওপরই ভারতবর্ষের মুক্তি নির্ভর করছে—স্বামীজির এই অনুশাসন সুভাষ গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু বিবেকানন্দ নন সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণের দিকেও আকৃষ্ট হয়। রামকৃষ্ণর শিক্ষার সার কথা ছিল, কেবলমাত্র ত্যাগের মাধ্যমেই উপলব্ধি বা মুক্তি সম্ভব। সুভাষচন্দ্র একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবগোষ্ঠী সংগঠিত করেছিলেন। ষোল বছর বয়সের আগেই গ্রামীণ পুনর্গঠনের কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

স্কুল জীবনের শেষে কলকাতার একটি দলের বার্তাবহ এক দূত তাঁর সঙ্গে কটকে দেখা করেন এবং এইভাবে সুভাষ প্রথম রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা পান। তাঁর খেয়ালি, একগুঁয়ে, অনমনীয় মনোভাব পিতা-মাতাকে চিন্তায় ফেললেও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সম্ভাবনাপূর্ণ উজ্জ্বল ছেলে সুভাষ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পিতা-মাতার নির্দেশে এরপর সুভাষ উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ই.এফ.ওটেন-এর সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন সুভাষ। শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়তে হয়। শুরু থেকেই সুভাষ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অদম্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুভাষ উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত সাতসমুদ্র পার হয়ে সুদূর ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফেরে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর অনুপ্রেরণায় তিনি স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা নেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে

*—এরপর পাঁচেরপাতায়*

# খাজা আনোয়ার শাহ বেড় ঃ ইতিহাসের সাক্ষী

**মনামী ঘোষ**

**আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা**

সালটা ১৬৯৫। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অভিযানে ব্যস্ত। তখন বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রাই। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাঠান সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন চিতুয়া বরোদার জমিদার শোভা সিং। শোভা সিং এর হাতে নিহত হন কৃষ্ণরাম রাই। রাজকুমারী সত্যবতী শোভা সিংকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। এসময় বিদ্রোহের রাশ চলে যায় রহিম খাঁর হাতে। ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁর পৌত্র শাহজাদা আজিম-উস-শান আসেন বর্ধমানে বিদ্রোহ দমনে। আজিম-উস-শান হয়তো যুদ্ধ বা রক্তক্ষয় চাননি। তিনি রহিম খাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন। রহিম খাঁ সন্ধি প্রস্তাব দেন।প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে আজিম-উস- শান তাঁর প্রধান উজির সৈয়দ খাজা আনোয়ার শাহ ও আবুল কাসেমকে পাঠান রহিম খাঁর শিবিরে। দক্ষিণ দামোদর এলাকার মূলকাঠিতে ছিল রহিম খাঁর শিবির। রহিম খাঁর মিথ্যাচার বুঝতে না পেরে তাঁরা নিরস্ত্র অবস্থায় কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে হাজির হন।রহিম খাঁ তখন অস্ত্রশস্ত্র সহ তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁদের হত্যা করেন। সৈয়দ খাজা আনোয়ার শাহ এবং আবুল কাসেমের সমাধি স্থানই হলো খাজা আনোয়ার শাহ বেড়। এভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন বলে তাঁদের শহিদ আখ্যা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে আজিম-উস-শান-এর পুত্র ফারুকশিয়র দিল্লির সিংহাসনে বসে, ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে সমাধি স্থলে লক্ষাধিক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান।

১০ বিঘা জমির ওপর সমাধিক্ষেত্রটি নির্মিত। খাজা আনোয়ার শাহর বংশধরদের 'নবাব' আখ্যা দিয়ে তাদের জন্য তৈরি করা হয় রাজপ্রাসাদ, মকবরা, বাঁধানো সরোবর, ফুলবাগান। প্রবেশদ্বারটি অর্ধবৃত্তাকার তোরণ। সামনেই একটি সরোবর। সরোবরের মাঝে আছে জলটুঙ্গি। পশ্চিমপাড় থেকে জলটুঙ্গি পর্যন্ত বহুখিলান যুক্ত

সেতু। গরমকালে এই জলটুঙ্গি বা হাওয়ামহল খুব আরামদায়ক ছিল।পূর্ণিমার সময় অপূর্ব সুন্দর লাগত এই জলটুঙ্গি। এই সরোবরের দক্ষিণপাড়ে সমাধিস্থল। খাজা আনোয়ার শাহ এবং আবুল কাসেমের সমাধির ওপর নির্মিত সৌধ। ইন্দো-সিরীয় স্থাপত্যরীতির নিদর্শন এটি। মাঝে গম্বুজের চারদিকে চারটি মিনার আছে। মূল সৌধের দুপাশে বাংলার দোচালা স্থাপত্য। সমগ্র সৌধটি বঙ্গ-ইসলামিক স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ। এই অংশটিতে শহিদদের বংশধরদের অনেকের সমাধি আছে।

সরোবরের পূর্বপাড়ে ছিল ইমামবাড়া। এখন আর নেই। পশ্চিমপাড়ে মসজিদ। তিনটি গম্বুজওয়ালা। ইতিহাসবিদদের মতে মসজিটিও ফারুকশিয়রের সময়কালে নির্মিত। মসজিদের দক্ষিণদিকে ছিল বেগমমহল। খাজা সৈয়দ আনোয়ারের মেয়ের বংশধরের এখানে থাকতেন। এটিও এখন আর নেই। এখানে ফুলের বাগান ছিল তার সাক্ষ্য বহন করছে কেয়ারি গুলো। সরোবরের উত্তর ও পূর্বপাড়ে স্নানের ঘাট। উত্তরপাড়ে ১৮৯৭ সালে নির্মিত বাড়িটিতে থাকতেন খাজা আনোয়ার শাহের মেয়ের শেষ বংশধররা।

এই সমাধিক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করা হয়। বর্গী আক্রমণে নাকি সনদটি খোয়া যায়। ১৭৬৭ সালে বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম আবার একটি সনদ দেন খাজা আনোয়ার শাহ বংশের আশরফ খানকে। এই পাঁচটি গ্রাম বর্ধমান রাজাদের জমিদারিভুক্ত ছিল এবং এগুলি বাবদ রাজার কাছ থেকে প্রতি বছর ৩৬৯০ টাকা পেতেন শহিদদের বংশধররা। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর বর্ধমানের জমিদাররা ৩৬৯০ টাকা সরকারি কোষাগারে দিতেন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই সৌধ রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য মাসিক তিনশো একুশ টাকা পাঁচ আনা চার পাই শহিদদের বংশধরদের নির্ধারিত প্রতিনিধিকে দেয়া হত।

এঁদের শেষ প্রতিনিধি হিসেবে যাঁর নাম জানা যায় তিনি মির্জা শি গুপ্তা। ১৯৪৮-এর মার্চ মাস পর্যন্ত প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকেও এই নবাববাড়ি প্রাঙ্গণেই সমাধিস্থ করা হয়।

সমাধিসৌধর মূলভবনটি তালা দেওয়া থাকে।বিকেলে বাতি জ্বালানো হয়।তখন খুলে দেওয়া হয়। আবার অন্য সময় দেখতে চাইলেও তালা খুলে দেখানো হয়। প্রতি বছর পয়লা মাঘ মেলা এখানে মেলা বসে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

# 'দেবদাস' খ্যাত হাতিপোতা গ্রামে মিষ্টিমেলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ জানুয়ারি :** কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসের জন্যই চির খ্যাত হয়ে আছে হাতিপোতা গ্রাম। সেই খ্যাতির পালকে আরেকটি খ্যাতি যুক্ত হয়েছে মিষ্টিমেলা গ্রাম। কালনা থানার নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রাম। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে বাংলা মাঘ মাসের ১ তারিখ থেকে বসে দেবদাস স্মৃতি মিষ্টিমেলা। এই মেলা চলে বেশ কয়েকদিনধরে। সন্ধ্যার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকে। সেই রীতি মেনে এবারও বসেছে মিষ্টিমেলা। বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন আকারের মিষ্টির দেখা মেলে এই মেলায়। একটা মিষ্টির সর্বোচ্চ ওজন ৫ কিলো পর্যন্ত হয়। হাজার টাকা পর্যন্ত একটা মিষ্টির দাম ওঠে। বছরের এই দিনগুলোতে মিষ্টির টানে এই মেলায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এসে হাজির হয়। তারা মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফেরেন। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটে এই মেলায়। ফলে দিন দিন এই মেলার আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান।


মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যবাসীর জন্য নিয়ে এসেছে 'দুয়ারে সরকার'

এই দৃষ্টান্তমূলক জনকল্যাণকর প্রকল্পে চতুর্থ পর্যায়ের কর্মসূচি শুরু হচ্ছে ১৮ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে। এখনও যাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করেননি, তাঁরা সত্বর চতুর্থ পর্যায়ের ক্যাম্পে এসে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করুন।

রাউন্ড ৪
১৮-২৫ জানুয়ারি
২০২১

দুয়ারে সরকার

এই পর্যন্ত সাফল্যের খতিয়ান
● ২ কোটি ১৬ লক্ষের বেশি মানুষ ক্যাম্পে উপস্থিত ● ১ কোটি ১৪ লক্ষ মানুষকে পরিষেবা প্রদান
● ২০ হাজারের বেশি সংখ্যক ক্যাম্প ● ৭০ লক্ষের বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য সাথী অন্তর্ভুক্তিকরণ
● ১০ লক্ষের বেশি মানুষকে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান ● ১০ লক্ষের বেশি মানুষকে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ
● ৫ লক্ষের বেশি কৃষককে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা প্রদান

যাঁর যখন যেখানে দরকার, আসছে আপনার দুয়ারে সরকার | প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা/পৌরনিগমে ৪টি ক্যাম্প

পাড়ায় সমাধান
নতুন বছরে, নতুন অভিযান

এলাকার আশু ও জরুরি সমস্যাগুলির অবিলম্বে সমাধান

● স্কুলে একটি অতিরিক্ত ক্লাসরুম ● ড্রেনেজ মাধ্যমে জল নিকাশি
● লিংক রাস্তার নির্মাণ ● পানীয় জলের অতিরিক্ত ট্যাপ-টিউব ওয়েল
● পাবলিক বাস ● জঞ্জাল সাফাই ● রাস্তার আলো ● কালভার্ট ● রোগীর জন্য অ্যাম্বুল্যান্স
● পাবলিক শৌচাগার ● শিক্ষক ও স্বাস্থ্যকর্মী ● সাবমার্সিবল পাম্প
● স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন

পাড়ায় সমাধান

এই পর্যন্ত সাফল্যের খতিয়ান
● ১০০০০টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে ● এর মধ্যে ১২০০টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে
● আরও ২৩০০টি প্রকল্পের কাজ চলছে ● বাকি প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে
● উপকৃত হবেন পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য রাজ্যবাসী

এই উদ্যোগের লক্ষ্য:
● আশু পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ
● আশু পরিষেবার ঘাটতি পূরণ
● গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদে লোক নিযুক্তি

এই উদ্যোগের অন্তর্গত:
● ৩৪২টি ব্লক
● ১১৮টি মিউনিসিপালিটি
● ৭টি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন

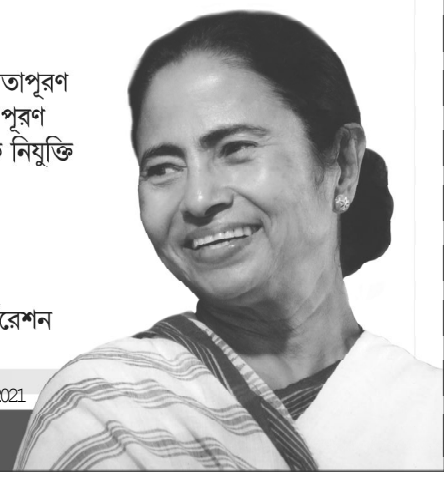

Memo No. : 18(5)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 17.01.2021

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

# কাজের দাবিতে যুব বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জানুয়ারি :** সকলের জন্য কাজ সহ বিভিন্ন দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি দেয় কালনার যুবরা। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-১ ও ২ এবং কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে কালনা-১ বিডিও দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন—যুবনেতা হালিম শেখ, অরিজিৎ রায়, পিংকি বৈরাগ্য, আতাবুল শেখ প্রমুখ। দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে সংহতি, কৃষি বিল প্রত্যাহার, সকলের জন্য কাজ, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য কমানো, ফেব্রুয়ারীতে যুবদের নবান্ন অভিযান সফল করার কথা বলেন বক্তারা।

কালনা-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দিতে যান একটি প্রতিনিধি দল। এই দলের নেতৃত্ব দেন—যুবনেতা সুভাষ সরকার, নেপাল সরকার, তারাচাঁদ সরেন প্রমুখ।

# এক জীবন্ত কিংবদন্তী

—*তিনের পাতার পর*

নেতাজির ভূমিকা ছিল শেষ সঙ্কটপূর্ণ পঁচিশ বছর। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিবর্তন সম্বন্ধে গভীর ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং বিশিষ করে ইংরাজদের ভারত বিজয় এবং শাসন সম্বন্ধে বাস্তব অনুশীলনের ওপর তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ঔপনিবেশিক দাসত্বে নিষ্পেষিত ভারতবাসীদের এবং ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ মূলগতভাবে পরস্পর বিরোধী। সুতরাং এই দুই-এর মধ্যে কোনোরকম সামঞ্জস্যবিধান বা আপস অসম্ভব। তাঁর এই চিন্তাধারা এবং বিশ্বাস ইংরাজ শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধিতার পথে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল এবং সবকিছু বুঝে এবং পরিকল্পিতভাবে দেশের মুক্তির জন্য আপসহীন সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন, লাহোরে পাল্টা সরকার গঠনের জন্য এবং সর্বাত্মক বয়কটের ডাক, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হরিপুরায় ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন এবং স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা হিসাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব এবং সবশেষে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরীতে ইংরাজের ভারত ত্যাগ করার জন্য চরমপত্র দেবার প্রস্তাব—এই সবগুলিই বুঝতে হবে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর ভাবগত, আদর্শগত এবং কৌশলগত ধ্যান ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে।

স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য সামনে নিয়েই সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই সারা পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সাধারণ অধিবেশনে রাসবিহারী বসু সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্বভার নেতাজির ওপর তুলে দেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই দিনটিকে নেতাজি বলেছিলেন—''আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন।'' কারণ সেই দিন তিনি প্রথম সিঙ্গাপুরের টাউনহলের বিপরীত দিকের মাঠে সর্বাধিনায়ক হিসাবে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করেন। তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন—''সশস্ত্র সংগ্রাম করে এবং রক্তের বিনিময়ে তোমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।'' ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসির রানি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের মহিলা যোদ্ধাদের এই বাহিনীটি নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে নেতাজির বিশ্বাস এবং জীবনের সব বিভাগে এবং মানবিক উদ্যোগে নারীদের সমান ও পূর্ণ সুযোগ দেবার তাঁর দৃঢ় সংকল্পের বাস্তব প্রকাশ। উল্লেখ্য ১৯৪৩-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই দুটি বছরের ইতিহাস অনেকখানি রচিত হয়েছে দেশ থেকে দূরে বিদেশের মাটিতে। আর এই ইতিহাস রচনা করেছেন প্রবাসী ভারতীয়েরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পঁচিশ বছর সুভাষচন্দ্রের এক অদম্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আদর্শগত, নীতিগত ও কৌশলগত দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে একমাত্র তিনিই মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বের পাশাপাশি এক বিকল্প নেতৃত্ব দেশবাসীর সামনে রেখেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি হরিজন পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী দেশের এই বিপ্লবী সন্তানটিকে সেরা দেশপ্রেমিক বলে উল্লেখ করে বলেন, ''নেতাজির নামটি যেন মুহূর্তে জাদু তৈরি করে....তাঁর দেশভক্তি অতুলনীয়, নেতাজী ও তাঁর সৈন্যদল শেখালেন কীভাবে শ্রেণি-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আত্মত্যাগ ও ঐক্য তৈরি করতে হয়, শেখালেন কাকে বলে শৃঙ্খলা।''

একজন মানুষ ও চিন্তাবিদ হিসাবেও নেতাজি একটি নতুন আদর্শের সন্ধান করেছিলেন—মানব সমাজের জন্য এক নতুন নীতিবোধ। সমসাময়িক বিশ্ব ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি একই সঙ্গে ভারতের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে প্রভাবিত, সামাজিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অংশীদার। তিনি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর অনন্যচিত্ত উৎসর্গ, অবাধ্য সাহস, বেপরোয়া আত্মত্যাগ এবং আদর্শের জন্য অন্তহীন আত্ম-সমর্পণ দিয়ে। যদিও তিনি তাঁর সময়ের অনেক আগেই চলে গেছেন, চিন্তায় এবং কাজে তাঁর উত্তরাধিকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

লেখিকা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা

# বিবেকানন্দের ধর্মভাবনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

—*দ্বিতীয় পাতার পর*

ব্যাপারে দুটি চরম হইল—ধর্মান্ধ ও নাস্তিক। যে নাস্তিক, তাহার কিছু ভাল দিক আছে, কিন্তু ধর্মান্ধের বাঁচিয়া থাকা শুধু তাহার ক্ষুদ্র 'আমি'টার জন্যই।... ধর্মান্ধকে কোনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।'' (১০/৪৫) দুই ব্যাঙের গল্পে কুয়োর ব্যাঙ সমুদ্রের পরিসর উপলব্ধি করতে না পেরে কীভাবে সমুদ্রের ব্যাঙকে মিথ্যাবাদী বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''সম্প্রদায়গুলিরও একই পন্থা। তাহাদের নিজেদের মতে যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে তাহারা দূর করিয়া দিতে এবং পদদলিত করিতে চায়।'' (১৯/২৪-২৫) এইভাবেই ''সাম্প্রদায়িকতা মানবগোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক সংঘর্ষ আনিয়া কল্যাণশক্তি হারাইয়া ফেলে।'' (১০/৯২)

বিবেকানন্দ এই প্রতীতিতে উপনীত হয়েছিলেন যে, ''যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বের অনন্ত অসীম সত্তার সহিত এক বলিয়া উপলব্ধি করে তখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়।'' (২/৩০৭) ''আমরা সকলেই একদিন একই ধর্মমত আশ্রয় করিব—ইহা একটি অলস স্বপ্ন।'' (১০/৩৫) তাই তাঁর উপদেশ, ''পৃথিবীর নানা ধর্ম লইয়া যে একটি মহান্ ঐকতান বাদ্য চলিতেছে, উহার মধ্যে শুধু একটি যন্ত্রকেই স্বীকার করিতে চাও কেন? সমগ্র বাদ্যটিকেই চলিতে দাও।'' (১০/৭৮) ''কোন এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম হয়তো সর্বাপেক্ষা উপযোগী। অনুরূপ কারণে আর একটি ধর্ম অপর এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে প্রশস্ত।'' (১০/৪২) তাঁর উপদেশ, ''আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি। যেন অপর জাতির আচার ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবে না।'' (১/৮৮)

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 'সকলের পক্ষে স্বীকার্য ও গ্রহণীয়' ধর্মের এক 'সার্বভৌম রূপ' (৩/১৫৪)-এর সন্ধান করেছিলেন বিবেকানন্দ। জাতীয় অক্যের সৌধ গড়ে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক ও ব্যবহারিক স্তরের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে নিয়ে এক মেলবন্ধন ঘটাবার কথা বলেছিলেন। তাই বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক আদর্শের সঙ্গে ইসলামের গণতন্ত্র, ঐক্য, সাম্যবোধ ও উগ্র মনোবল এবং 'বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা' (৬/৩৬৪)-র মহাসমন্বয়ে ভারতবর্ষে এক 'মাদার রিলিজন' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দ।

**শূদ্র উত্থান**

বিবেকানন্দ অবশ্যই রাজনৈতিক চিন্তক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ধর্মভাবনা ও সমাজভাবনারই আবশ্যিক সম্প্রসারণ ঘটেছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। ভারতীয় জাত-ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে নিচু জাত তথা শূদ্র, অর্থনৈতিক বিচারে তারাই সমাজের সবচেয়ে গরিব শ্রেণি। তাই ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরবিন্যাসে যেমন, সমাজের সবচেয়ে গরিব অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসাবেও তেমন তারা চূড়ান্ত শোষণের শিকার। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নিম্নবর্গের মানুষকেই এই অর্থে তিনি 'শূদ্র' হিসাবে অভিহিত করেন। স্বভাবতই, শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থনৈতিক শোষণ থেকে এই শোষিত শ্রেণির মুক্তির প্রশ্নটি তাই অর্থনীতির উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বের যে স্থিত ব্যবস্থা তার পরিবর্তনের প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। এই পরিবর্তনেরই অনিবার্যতা ঘোষণা করে বিবেকানন্দ বলেন, ''এমন দিন আসবে যখন শূদ্র শ্রেণীর শূদ্রত্ব নিয়েই উত্থান ঘটবে।... শূদ্রগণ শূদ্রগত স্বাভাবিক প্রকৃতি ও আচার নিয়েই প্রত্যেক দেশে পূর্ণ প্রভুত্ব গ্রহণ করবে।'' (৪/৪০১) অর্থাৎ ''বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'' (৬/২৪১) এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেই ভারতে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বের পুরোধা প্রচারক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অগ্রজ বিবেকানন্দকে ভারতের প্রথম সোস্যালিস্ট হিসাবে অভিহিত করেছেন।

উদ্ধৃতি—খণ্ড/পৃষ্ঠা, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা), প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯

# চলছে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের অশিষ্ট ধারাভাষ্য

**মুরারী মণ্ডল**

২০২১-এর নির্বাচনী দামামা বেজে গেছে। দিনক্ষণ এগিয়ে আসার তালে তাল দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রচার প্রক্রিয়ার ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে বিধানসভা ভোটের তরঙ্গায়িত মাঝনদীতে।

রাজ্য রাজনীতির বর্তমান চলমান ময়দানে প্রচারযন্ত্রের কৌশলে এগিয়ে থাকা প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল। তারা গ্রাম-গঞ্জ শহর নগরে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং জীবন জীবিকার দগদগে সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জমাট বাতাবরণে প্রতক্ষভাবে মশগুল থাকছে। দলদুটির রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ হবে বুঝে নিয়ে, সর্বশক্তি দিয়ে মনোনিবেশ করেছে সুপরিকল্পিতভাবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি সর্বোপরি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বেমালুম উধাও দৈনন্দিন তাদের নানা কর্মকাণ্ডে।

রাজ্যে ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রাজ্য এবং কেন্দ্রের উভয় শাসকদলই নিজেদের সীমাহীন ব্যর্থতা ঢাকতে, এই হিংসার ঘটনাবলিকে সবচেয়ে বেশি সামনে তুলে আনার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভয়াবহ জনবিরোধী অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গোটা দেশকে একেবারে আগ্নেয়গিরির প্রান্তসীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে। আর এস এস-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রচার, প্রসার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন একটা সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যবাদে পরিণত হয়েছে। সংসদ এবং আদালত সহ সব স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির সত্তা খতম করা হচ্ছে, যা একমাত্র ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়। অতিমারিজনিত পরিস্থিতির দরুন দেশব্যপী তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। বেকারি ও কর্মহীনতার দেশে গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে উপস্থিত লকডাউনজনিত বল্গাহীন শ্রমিক ছাঁটাই। কেন্দ্রীয় সরকার এখানে শ্রমজীবীদের পাশে না দাঁড়িয়ে শিল্প-কারখানার মালিকদের পক্ষেই সওয়াল করে যাচ্ছে। কাজ হারানো কর্মী বা কর্মক্ষেত্রের শ্রমিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নিজস্ব চেনা জানা পরিমণ্ডলের বাইরে গিয়ে, অনিশ্চিত পরিবেশে রুটিরুজির সন্ধানে বেরুতে বাধ্য হচ্ছে কতো তরুণ-তরুণী।

ভারতের মোট শ্রমিকদের মধ্যে আশি শতাংশই অসংগঠিতক্ষেত্রে কর্মরত। কার্যত তাদের বেশিরভাগ কর্মহীন। তুলনামূলকভাবে উচ্চ বেতনের শ্রমিকদেরও হাল প্রায় একই রকম। অর্থনীতি নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করা বিশেষজ্ঞরা দেশের অর্থনৈতিক মন্দা বিষয়ে বেশ চিন্তিত। জিনিসপত্রের নাগালের বাইরে যাওয়া আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, গরিবদের সঙ্গে উচ্চবিত্তদেরও এক সারিতে এনে হাজির করেছে।

বিধানসভা নির্বাচনে যাতে কোনভাবেই এই জ্বলন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় মানুষের মনে বিন্দুমাত্র দাগ না কাটে, তার জন্য বিজেপি উগ্র ধর্মান্ধতা, মৌলবাদী অবস্থান ও জাতিভেদের সুড়সুড়িকে তীব্রতর করছে। মানুষ তার জীবন-জীবিকার গভীরতর ক্ষতিকর বিষয়ে অজ্ঞাত থেকে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়ছে তাৎক্ষণিক জাত ধর্ম ইত্যাদি ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি। মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর এমন কৌশলে লাভও হচ্ছে বিজেপির।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশ বছরের শাসনকাল, পুরোমাত্রার বৃদ্ধাবাসের উদাহরণ স্বরূপ। চাকরি না পেয়ে শিক্ষিত বেকাররা ভিন্ রাজ্য হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া কায়িক শ্রমনির্ভর মানুষজন নিজ রাজ্যে পেটের ভাত যোগাড় করতে না পেরে বাধ্য হচ্ছেন পরিবার পরিজন ছেড়ে বিদেশ বিভূঁয়ে যেতে। গত দশবছরে রাজ্যে ছোট মাঝারি বড় কোনো মাপের শিল্প বা কারখানা গড়ে ওঠেনি। মমতা বন্দোপাধ্যায় মানুষের আশা আকঙ্ক্ষার গলা টিপে, তাঁর অরাজনৈতিক কার্যক্রমগুলিকে সামনের সারিতে রেখে,ক্ষমতায় আসীন হওয়া থেকে টিকে থাকার প্রদ্ধতি হিসাবেও রাখতে চাইছেন। তাঁর আমলের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, সীমাহীন দুর্নীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করা ফ্যাসিস্ট আচরণের পরিবেশে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলও রাজ্যে ক্রমশ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে পৌঁছেছে।

এমন আবহাওয়ায় রাজনৈতিক হিংসা বল্গাহীন আকারে এসে দাঁড়িয়েছে। খুন জখম রাহাজানি, গোরু পাচার, কয়লা পাচার, মাটি পাচার এমনকি নারী শিশু পাচারও রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিদিনকার ধারাভাষ্য। একদিকে মমতা বন্দোপাধ্যায়। বিপরীতে বিজেপি। বিজেপি-র বিরোধীশূন্য, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেছে। মমতার গত দশবছরের রাজ্য শাসন তারই প্রতিধ্বনি। নির্বাচন এগিয়ে এলেই অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের চাপে রাখতে, কেন্দ্রের তরফে ফাইল চালাচালির কূনাট্য শুরু হয়ে যায়। এটাও উভয় দলের রাজনৈতিক 'দ্বিমেরু তত্ত্ব'-কে শক্তিশালী করার কৌশল মাত্র। ভোট ময়দানে তারাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চায়। নীতিহীন তরজায় মানুষের ভাত কাজ আশ্রয়ের মতো মৌলিক বিষয়গুলি ভুলিয়ে দিতে চায়। অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে মাঠে নামার রাস্তা ব্যারিকেড করে রাখার পরিকল্পিত প্রয়াস।

রাজনৈতিক দলগুলির শৈল্পিক ও কৌশলী নৃত্যনাট্যে বিভ্রান্ত না হয়ে ভোট দেওয়ার আগে নির্বাচকদের বিবেচনায় রাখা জরুরি—প্রথমত, রাজনৈতিক দলের নীতি, নৈতিকতা ও দলীয় শৃঙ্খলার দিকটি। দ্বিতীয়ত, দলীয় প্রার্থীর (শিক্ষাগত সহ) যোগ্যতা। নির্বাচনে জয়ী হতে চাওয়া প্রার্থীদের ক্রিমিনাল কেস চলছে কিনা। তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ কত। শাসকদলের প্রার্থী হলে বছরে বছরে সম্পত্তি বৃদ্ধির হার। আয়ের উৎস। আগের নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে শাসকদলের সদিচ্ছা ও রূপায়ণের গতিপ্রকৃতি। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা না মিটিয়ে বা আগ্রহ, মনযোগ না দিয়ে শাসকের দান-খয়রাতের মতো চটকদারিতে না ভোলা। প্রলোভনে পড়ে রাজনৈতিক দলের ভোটে জেতার বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে আমজনতার তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থকে গুলিয়ে না ফেলা।


## নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি মধুসূদন বাগ পিতা বিজয় বাগ গ্রাম-চৈত্রপুর পোঃ জোৎরাম, থানা-শক্তিগড় জেলা-পূর্ববর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমান-এর নিকট ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে এক এভিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে এল.আই.সি সার্টিফিকেট নং 465365975 আমার নাম ভুলবশতঃ কান্ত বাগ নথিভুক্ত হয়েছে। মধুসূদন বাগ ও কান্ত বাগ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

# আলু চাষিদের মাথায় হাত

**কিশোর মাকর :** ৪৫ টাকার আলু এখন মাঠে দাম ৮ টাকা। সাপলুডো খেলার মতো অবস্থা। এই খেলায় সর্বশান্ত হয় চাষি। সোমবছর পকেট কাটা যায় আমজনতার। দুদিন আগে যার দাম আকাশছোঁয়া তা এখন জলের দরে। চাষি একে নিয়তির উপর ছেড়ে দেয়। গতবছর তাও দু'পয়সা লাভের মুখ দেখেছি। এবার খরচ দ্বিগুণ। জানালেন পলেমপুরের অর্জুন মালিক। বেশি দামে বীজ কিনে শংকর জাতের আলু লাগিয়েছিলাম। জলদি জাতের আলু লাগিয়ে দু'পয়সা বেশি পাওয়ার আশায়। এই তো দেখছেন আজকের মাঠের দাম ৩৮০ টাকা বস্তা (৫০ কেজি)। হিসাব দিয়ে বললেন বিঘাপিছু ৩৫০০০ টাকা খরচ। মালিককে দিতে হবে ৫০০০ টাকা। ফলন দেখা যাচ্ছে বিঘা পিছু ৭০-৮০ বস্তা। ভাগচাষি হয়ে আমি কি আলু রেখে দাম ধরতে পারবো? বিঘাপিছু ৪০০০ টাকা লোকসানে বিক্রি করতে বাধ্য। পাশের জমির মালিক শান্তি দাস জানান, কার জন্য দাম আকাশছোঁয়া হয়, কার জন্য দাম কমে তা জটিল অঙ্ক আমাদের জানা নেই। একটা কথা এবার জেনেছিলাম নতুন কৃষি আইনের জন্য এখানকার আলু অন্য রাজ্যে চলে যাবে। মাঠ থেকে আলু হু হু করে নিয়ে যাবে। দাম পাবে চাষিরা। সেই আশা নিয়ে দ্বিগুণ খরচ করে আড়াই বিঘা চাষ করেছি। এক বিঘা নিজের। জ্যোতি আলু চাষ করেছি। এক মাস পরে আলু উঠবে। দাম তো পাওয়া যাবেই না। তবু আমরা আবার পরের বার চাষ করবো। আশায় মরে চাষা। এর সুযোগ নেয় সরকার, সমাজ। আর এক চাষি শিশির ঘোষ জানালেন চাষির নিজস্ব সত্তা নেই। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকা কৃষক তাঁর নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে। সরকার সাপলুডোর মতো খেলে কৃষকসমাজকে নিয়ে। তাঁর দাম চোকাতে হচ্ছে দিল্লির সরকারকেই। সারা দেশের কৃষকসমাজ দিল্লি অবরুদ্ধ করেছে। জয় হবেই।

এবার জেলায় নির্বিঘ্নে ৮০ হাজার একরে আলু চাষ হয়। দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল হিসেবে কালনা, পূর্বস্থলী, মেমারি, জামালপুর, রায়না, খণ্ডঘোষ, আউশগ্রাম প্রভৃতি এলাকাতে এখনো পর্যন্ত আলুর মালট নেই। ফলনও ভালো হওয়ার আশায় চাষি। জ্যোতি আলু উঠবে এক মাস পরেই। তার আগেই সিঁদুরে রাঙা মেঘ দেখছে চাষি। ৬০০ টাকা বস্তা দাম পেলে লাভের মুখ দেখার আশা থাকবে। ১২ টাকা কেজি আলুর দাম পেলে ক্রেতার কি খুব অসুবিধা? চাষি জটিল অঙ্ক না বুঝলেও সরকারের সদিচ্ছার অভাবে বারবার চাষিকে চাষ করে যেতে হবে। এর শেষ কোথায় তা ভবিষ্যৎ বলবে।

## সুভাষচন্দ্র বসু : সমাজতন্ত্র-বামপন্থা- কমিউনিজম

*—তিনের পাতার পর*

এই পাঁচজনের একজন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৯ খ্রিঃ প্রধানত কমিউনিস্টদের সমর্থনেই সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তিকেই (জার্মানি, ইতালি, জাপান) মিত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন আর কমিউনিস্টরা ছিলেন ফ্যাসি-বিরোধী শিবিরে (ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স)। কমিউনিস্টদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের এই মতপার্থক্যকে ব্যবহার করে কোনো কোনো কমিউনিস্ট-বিদ্বেষীরা আজও কমিউনিস্টদের হেয় করার চেষ্টা করে থাকেন। মনে রাখতে হবে সুভাষচন্দ্র ভারত থেকে কাবুল হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য রাশিয়ার সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি 'শত্রুর শত্রুই আমার মিত্র' প্রাচীন কৌটিল্যের আমলের এই রাজনৈতিক ফর্মুলাকেই প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটি একটি রণকৌশল। তাই ভাঙা ডাল অথবা শুকনো পাতা দেখে সমগ্র বৃক্ষকে বিচার করতে নেই। জার্মানির পরাজয়ের পর সম্ভবত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। যুদ্ধের পর আজ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে আর সশরীরে দেখা যায়নি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি আকুতি আজও প্রেরণা যোগায়। যেমন বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বাঙালি মানসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার আতুরঘর হিসাবে গণ্য হওয়া আমাদের ভালো লাগে। গর্ব অনুভব হয় ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রথম ম্যানিফেস্টোর অনুবাদ হয় একথা জানতে পারায়। আরও ভালো লাগে একথা জেনে যে এই অনুবাদ করেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি রবীন্দ্রনাথের নাতি। কেবল তাই নয়, তিনি ভারতের শ্রমিক কৃষক পার্টিতে যোগ দেন এবং তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।

**সহযোগী গ্রন্থ :**

১) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ—তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
২) পশ্চিমবঙ্গ—নেতাজি সংখ্যা—১৪০৩
৩) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ
৪) গোরা—রবীন্দ্রনাথ।

**লেখক : শিক্ষক ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা**

# কুলদীপ সিং সালুজা প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী কুলদীপ সিং সালুজা ১৭ ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বর্ধমান গুরুদেয়ারা প্রবন্ধক সমিতি, বিশ্ব জাগৃতি মিশন, হরি ওম সৎসঙ্ঘ সমিতি, অল বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট, বর্ধমান জেলা বাস পরিবহন সংস্থা, রোটারি ক্লাব, বর্ধমান ব্যবসায়ী সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। এছাড়াও শহিদ শিব শঙ্কর সেবা সমিতির মতো স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলেই শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর স্ত্রী ৩ পুত্র, ১ কন্যা বর্তমান।

# শ্রীগোপাল ব্যানার্জী (ভানুদা) প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক এবং ব্যক্তিত্ব শ্রীগোপাল ব্যানার্জী (ভানুদা) ১৮ ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ছিলেন। বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বর্ধমান জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল সংস্থা, চিলড্রেন কালচারাল সেন্টার, বর্ধমান শিশু উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি, কল্যাণ স্মৃতি সংঘের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্ধমান নিয়মিত বিনোদীমাধব সামন্ত কোচিং নামে ক্রিকেট ও ফুটবল কোচিং চালাতেন। এছাড়াও এই শহরের ক্রীড়া উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

# সূর্য সেন ও বিবেকানন্দকে স্মরণ করল যুবরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জানুয়ারি :** ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আজ একগুচ্ছ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯তম জন্মদিবস এবং মাস্টার সূর্য সেনের আত্ম বলিদান দিবস পালন করা হয়। সংগঠনের উদ্যোগে কালনা পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ড নিয়ে আন্ত ওয়ার্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরুর আগে আজ ওয়ার্ডগুলি নিয়ে লটারি হয়। এদিনকার লটারির ফলাফল অনুযায়ী ওয়ার্ডগুলির খেলা বিভিন্ন দিনে হবে। এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করে তুলতে কালনা শহরে এদিন বিভিন্ন দেওয়াল লিখন করে যুবরা।

# পায়রা ক্রপিং পদ্ধতিতে সর্ষে চাষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জানুয়ারি :** ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়া, ধান উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাওয়া, মাটির তলার জলস্তর নেমে যাওয়া সহ বিভিন্ন কারনে রবি মরশুমে বোরো ধান চাষ অনেকটাই কমেছে। কিন্তু তা সত্বেও বোরো ধানের চাষ এখনো বহাল রয়েছে বেশ কিছু এলাকায়। আমন ধান তুলে সেই জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়। এটাই চিরাচরিত রীতি। এর কোন নতুনত্ব নেই। কিন্তু এই দুই ফসলের মধ্যবর্তীতে যে স্বল্প মেয়াদি সর্ষে চাষ করা হয়, তার মধ্যে নতুনত্ব আছে। কারণ জমিতে আমন ধান থাকা অবস্থায় কর্ষণহীন পায়রা ক্রপিং পদ্ধতিতে এই চাষ করা হয়। যেখানে খরচ একেবারে নামমাত্র। বর্তমানে সময়ে এই পদ্ধতিতে সর্ষে চাষ হচ্ছে কালনার কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই এলাকার কৃষক আরমান শেখ, কেরামত শেখ, আলম মোল্লা, নুরু মল্লিক, প্রমুখরা জানান—আমাদের এলাকার কোন কোন মাঠে এখনো বোরো ধান চাষ হয়। আমন ধান তোলা থেকে বোরো ধানের চারা রোপন পর্যন্ত বেশ কিছু দিন জমি ফাঁকা পড়ে থাকে। আমরা সেই সময়টা জমি ফেলে না রেখে পায়রা ক্রপিং পদ্ধতিতে সর্ষে চাষ করি। এটা খুবই লাভজনক, কারণ চাষে খরচ নেই বললেই চলে। সাধারণত আমন ধানে পাক ধরার সময় জমিতে জো থাকে। তখন ধান গাছের মধ্যেই বিঘা প্রতি এক কেজি সর্ষের দানা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই দানা অংকুরিত হয়ে সর্ষে চারা ধান গাছের মধ্যেই বড় হতে থাকে। আমন ধান কাটার পর অবস্থা বুঝে সর্ষে জমিতে কিছু সার দিয়ে দু একটা সেচ দেওয়া হয়। এখন সর্ষে গাছে ফুল-ফল এসে গেছে।

কৃষকরা জানান—এবার মনে হচ্ছে ফলন ভালোই হবে। বিঘা প্রতি চার পাঁচ মন ফলন হওয়ার সম্ভবনা আছে। কৃষকদের দাবি কালনাতেই বহু বোরো ধান চাষ করার জমি শুধু শুধু পড়ে থাকে। ওই সব জমিতে সর্ষে চাষ করলে সারা বছর রান্নার তেলের অভাব হবে না। বাড়তি সর্ষে বিক্রিও করা যায়। তাই পায়রা ক্রপিং পদ্ধতিতে সর্ষে চাষ করলে কৃষকরা লাভবানই হবেন।

# আপেল চাষ চাষিদের বিপুল সম্ভাবনা

*—প্রথম পাতার পর*

উদ্দেশ্যে ইকো ক্লাবের ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষকগণকে চাষের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

গুজরাট, বাংলাদেশের সিলেট, উত্তরপ্রদেশে বাণিজ্যিক ভাবে আপেলের চাষ হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা করিয়ে স্কুল বুঝতে পারে, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে এই এলাকার। সেই কারণে আপেলের চাষ করার চিন্তাভাবনা শুরু করে স্কুল প্রশাসন।

ন্যাশনাল ইনভেশন ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আশা করা যাচ্ছে চারা গাছ রোপণের পর উৎপাদন হতে সময় লাগবে দু'তিন বছর। একটি গাছ থেকে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ কেজি আপেল উৎপাদিত হবে এবং পরবর্তী দশ বছরে তা ৮০ থেকে ১০০ কেজি প্রতি বছর হবে।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে এলাকার কৃষকগণের মধ্য সঞ্চারিত করতে স্কুল বিশেষ ওয়ার্কশপের পরিকল্পনা করেছে। এই পরীক্ষা সফল হলে বাড়তি আয়ের জন্য স্থানীয় শ্রমিকদের ভিনদেশে যেতে হবে না। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরা।

## ১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. আন্তর্জাতিক শিক্ষা শ্রমিক নিশ্চিহ্ন করার বর্ষ, আর্জেন্টিনা। ২. ২০০৮ সালের ১১ জানুয়ারি, নিউজিল্যান্ডে। জন্ম ২৯.৭.১৯১৯, শৃঙ্গ জয় ২৯.৫.১৯৫৩। ৩. ১৮৬৭ সালের ১২ জানুয়ারি, লন্ডনে, মৃত্যু ২২.১১.১৯১৬। ৪. ১৯৮৫ সালের ১২ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে। ৫. ১২ আগস্ট। ৬. রাকেশ শর্মা, ১৯৪৯ সালের ১৩ জানুয়ারি, পাতিয়ালায় জন্ম, মহাকাশে যান ১৯৮৪ সালের ২ মে। ৭. লুইসি ব্রাউন, ১৯৭৮ সালে জন্ম। নিজের পুত্রের জন্ম ২০০৭ সালের ১৩ জানুয়ারি। ৮. ১৯১১ সালের ১৪ জানুয়ারি, বর্ধমান জেলার বাহাদুরপুরে। বিনয় চৌধুরী, বর্ধমান জেলার শুটরা গ্রামে। ৯. ১৯৬৫ সালের ১৪ জানুয়ারি। ১০. ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি। জন্ম ১৯২৪ সালের ২ অক্টোবর। ১১. ১৮৬০ সালের ১৭ জানুয়ারি, রাশিয়ায়। ১২. ১৯২২ সালের ১৭ জানুয়ারি।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

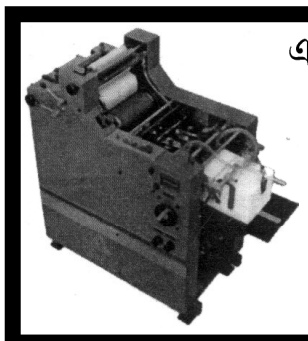

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা